‘স্টেশনে ঘুমান শিশুদের নিয়ে লিখেছিলাম গানটি’

*আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলাই সবার দায়িত্ব। এই ভাবনা থেকেই গীতিকবি শহীদ মাহমুদ জঙ্গী লিখেছিলেন: আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে,/আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই,/আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে হেসেছে,/আমরা চিরদিন সেই হাসি দেখতে চাই। গানটি কণ্ঠে তুলেছিল রেনেসাঁ ব্যান্ড। জাতিসংঘ জরুরি শিশু তহবিল তথা ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি পায় গানটি। আগামী ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। রঙ বেরঙ কথা বলেছে **শহীদ মাহমুদ জঙ্গী**র সঙ্গে।*

‘আজ যে শিশু...’ গানটি ইউনিসেফ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এই গানের পেছনের গল্পটি জানাবেন?

আমি অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করি। চট্টগ্রামে একটি বেসরকারি কলেজে পড়াতাম। পরে আমি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হই। সেসময় ঢাকা থেকে গিয়ে ক্লাস নিতাম। কলেজটিতে ডে-নাইট শিফট ছিল। আমি দুই শিফটেই পড়াতাম। সপ্তাহে চারটি ক্লাস নিতাম। তো, ঢাকা থেকে রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম যেতাম। সকালবেলা স্টেশনে দেখতাম, খোলা আকাশের নিচে ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। শুধু ট্রেন স্টেশন না, আরও অনেক জায়গায় এরকম দৃশ্য দেখা যেত। ফুটপাথে, সিঁড়ির নিচে এই ছবি দেখা যেত। শিশুদের ওই মানবেতর জীবন যাপন দেখে আমি ভাবতাম, যে শিশুটি পৃথিবীতে এলো তার জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী প্রয়োজন। তখন মাথায় গানটির ভাবনা এসেছিল। পরে গানটি পিলু খান সুর করেন। এভাবেই গানটির জন্ম। তার পরে তো ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি পায় গানটি।

গানটি ব্যান্ড ঘরানার। ব্যান্ডের বাইরের শিল্পীরাও গেয়েছেন। একটি টিভি অনুষ্ঠানে গুণী শিল্পী কলিম শরাফী গানটি গেয়েছেন...

ওই অনুষ্ঠানের বিষয়টি এরকম ছিল যে ব্যান্ডের গান গাইবেন আধুনিক গানের কণ্ঠশিল্পীরা আর তাদের গান ব্যান্ডশিল্পীরা গাইবেন। সেখানে একক শিল্পীদের মধ্যে কলিম শরাফী, নিলুফার ইয়াসমিনসহ অনেকে ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে আমার গান বাছাই করেছিলেন কলিম শরাফী। প্রথমে নিজের জন্য ‘আজ যে শিশু’ গানটি পছন্দ করেন। এরপর নিলুফার ইয়াসমিনের জন্য বাছাই করেন ‘হৃদয় কাদামাটির কোনো মূর্তি নয়’ গানটি। পরে শুনেছি গান দুটি শোনার পর খান আতাউর রহমান আমাকে খুঁজেছেন। গান দুটির বেশ প্রশংসা করেছেন তিনি।

আপনার শিশুবেলার কথা শুনতে চাই। সে কি শান্তশিষ্ট না কি ডানপিটে ছিল?

হা হা হা। একটা গল্প বলি। আমাকে ছোটবেলায় যে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল সেটিকে সবাই বলত জেল স্কুল। স্কুলটির প্রকৃত নাম হলো মছজিদ্দা উচ্চ বিদ্যালয়। সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেদের এই স্কুলে ভর্তি করা হতো। আমাকেও মনে করো একই কারণে ওই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।

আপনার শিশুবেলার দুষ্টামির কথা জানতে চাই...

স্কুল পালাতাম। পালিয়ে পাবলিক লাইব্রেরিতে যেতাম। রূপকথার বই পড়তাম। একটা বেজে গেলে যেতাম খুরশীদ মহল সিনেমা হলে। ওটা আমার চাচার ছিল। ওই সময় চাচাতো ভাইয়েরা সেখানে থাকত না। আমি তখন গিয়ে ঢুকে পড়তাম। ছবি টবি দেখে বিকেলের দিকে ফিরতাম বাড়ি। কয়েকবার ধরাও খেয়েছিলাম। তারপর আমাকে ওই জেল স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ওখানে এক বছর ছিলাম। আমি তখন জানাই, আমি ওই স্কুলে আর পড়তে চাই না। বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় সবাই বেশ খুশি ছিল। কিন্তু তারপরও ভরসা করতে পারছিল না। আবার যদি আগের মতো স্কুল পালানো শুরু করি। পরে আমাকে ওই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়।

গানের প্রতি ভালোলাগা শুরু হয় কেমন করে?

বাবা-মা দুজনেই গান অনুরাগী ছিলেন। বাবা প্রচুর গান শুনতেন আর মা গুনগুন করে গাইতেনও। এছাড়া প্রতিসপ্তাহে আমাদের বাসায় আব্বাস ফকির নামে একজন এসে গান করতেন। তার গান শুনতাম। পরে তার গাওয়া

মাইজভাণ্ডারীর গানগুলো ফিরোজ সাঁইরাও গেয়েছেন। ওই জায়গা থেকে গানের প্রতি ভালোলাগা শুরু। এরপর আমি যখন নবম শ্রেণির ছাত্র সেসময় আমার এক কাজিন ছিলেন তিনি সচীন দেব বর্মনের গান শুনতেন। তার দেখাদেখি এস ডি বর্মণ দ্বারা প্রভাবিত হই। আর ডি বর্মণ দ্বারাও প্রভাবিত হই। এভাবেই গানের প্রতি ভালোলাগা শুরু।

প্রথম গান কবে লিখেন?

আমি প্রথম গান লিখি ১৯৭৭-৭৮ সালে। স্বাধীনতাপরবর্তী সময় আমাদের ওখানে সংস্কৃতিক চর্চা হতে থাকে। এ সময় 'সৈকতচারী' নামে গানের একটি দল ছিল। ওখানে নকীব খান লিড করত। কয়ার গান করা হতো। আমরা চাইছিলাম, নিজেদের কিছু গান তৈরি করতে। নিজেদের লেখা, সুর করা। তখন আমি গান লেখা শুরু করি। এভাবেই শুরুটা হয়েছিল।

দেশের ব্যান্ড সংগীতে আপনার অবদান অপরিসীম। শুরুটা যদি বলতেন।

স্বাধীনতাপরবর্তী সময় দেশের সংগীতেও একটা পরিবর্তন আসে। সেসময় 'মনে পড়ে রুবি রায়'সহ কলকাতার গানগুলো শুনত তরুণরা। হিন্দি গানও চলত। এরপর শুরু হয় আজম খানের গান। আজম খান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হাটে মাঠে ঘাটে 'ওরে সালেকা', 'হাইকোর্টের মাজারে' গানগুলোর দারুণ জনপ্রিয়তা। তিন চার বছর এটা চলে। এরপর দেখা যায় চারদিকে মান্না দের গান বাজছে। এটা ১৯৭৬ সালের দিকে। সেইসঙ্গে খুরশীদ আলম, মাহমুদুন্নবীর গান খুব চলছে তখন। এরপর ১৯৭৭ সালের দিকে হঠাৎ দেখলাম একটা লোক গিটার নিয়ে বিটিভিতে গাইছেন, 'এই নীল মনিহার', 'আবার এলো যে সন্ধ্যা'। তিনি লাকি আখন্দ। তো সেসময় ঢাকা থেকে লাকি আখন্দ যা গাইছেন চট্টগ্রামে সোলসও সেরকম গান করছিল। আমরা একটি নতুন ট্রেন্ডে ঢুকে গেলাম। এই ধারা চলে ৮০ সাল পর্যন্ত। এভাবে শুরু হয় ব্যান্ডের উত্থান। তারপরের গল্প তো সবার জানা।

প্রয়াত কিংবদন্তি ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চুর সাথে আপনার অন্যরকম আন্তরিকতা ছিল...

আইয়ুব বাচ্চুর সাথে প্রথম দেখা হয় ওর বয়স যখন ১৫/১৬ বছর। ১৯৭৭-৭৮ এর দিকের কথা। একদিন সন্ধ্যায় আমরা চট্টগ্রাম শিল্পকলার মাঠে আড্ডা দিচ্ছি। আমাদের সৈকতচারীর অনুষ্ঠানও হতো। সেসময় একদিন বাচ্চু বসে সেখানে। বেশ মোটাসোটা ঝাঁকড়া চুল, সুন্দর ছিল। ও সম্ভবত কুমার বিশ্বজিতের সাথে এসেছিল। আমি জানতাম চাইলাম, কী করে ও। সে জানাল, 'রিদম ৭৭' নামের একটি ব্যান্ডে বাজায়, মাঝে মাঝে ইংরেজি গান করে। আমি তাকে তখন বাংলা গান করতে বলি। তখন সে আমার কাছে লিরিক চেয়ে বসে। আমি বলি, তোমাকে লিরিক দিলে সুর করবে কে। ও বলে আমিই চেষ্টা করব। ওর কথাগুলো আমার সাহসী মনে হয়েছিল। তখন সাথে কাগজ কলমও ছিল না। ও কোথা থেকে যেন কাগজ কলম নিয়ে এসে দিল। পরে ওকে চারটি লাইন লিখে দিলাম। 'হারানো বিকেলের গল্প বলি, সাগর তীর ধরে এগিয়ে চলি, কাশবন পেছনে ফেলে...'। লাইন চারটি দিয়ে বলি সপ্তাহ খানেক পর দেখা করতে। তখন থেকেই ওর সাথে পরিচয়। পরে ও সোলসে থাকা অবস্থায় গানটি রেকর্ড করে।

১৯৭৭-৭৮ সালে প্রথম গান লেখেন শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। এ সময় 'সৈকতচারী' নামে গানের একটি দল ছিল। তিনি চাইছিলেন, নিজেদের কিছু গান তৈরি করতে।

খোলা আকাশের নিচে ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। শিশুদের ওই মানবেতর জীবন যাপন দেখে আমি ভাবতাম, যে শিশুটি পৃথিবীতে এলো তার জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী প্রয়োজন। তখন মাথায় গানটির ভাবনা এসেছিল। এভাবেই গানটির জন্ম।

শহীদ মাহমুদ জঙ্গী

ব্যান্ডে অন্যতম একটি অংশ রক সংগীত। এর সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনে আপনার লেখা একটি গানের মাধ্যমে।

সেসময় বিটিভিতে ব্যান্ডের অনুষ্ঠান হবে। ওই অনুষ্ঠানে গান করবে সোলস। বাচ্চু তখন সোলসে বাজায়। তবে গায় না। গায় তপন। কিন্তু কোনো এক কারণে তপন নেই সেসময়। কী করা? তার আগে বাচ্চু সোলসে কখনও গায়নি। তারপরও ঠিক হলো ও-ই গাইবে। দুটি মাইক্রোবাসে ঢাকা এলাম আমরা। একটিতে ব্যান্ডের অন্যরা। আর আরেকটিতে আমি বাচ্চু, পার্থ বড়ুয়া ও রনি। 'ঘুম ভাঙা শহরে' গানটির কয়েক লাইন আরও আগে লিখে দিয়েছিলাম। সেদিন ঢাকা আসার পথে বাকি গানটা লিখে দেই। বাচ্চু গাড়িতেই গানটি সুর করে ফেলে। পরে ঢাকায় পৌঁছে রাত ৩টা পর্যন্ত ওরা গানটি নিয়ে কাজ করে, মিউজিক করে। ওই রাতেই গানটি সম্পূর্ণ করে তারা। পরদিন ওই গানটিই বিটিভিতে গায় বাচ্চু। ওটি ছিল তার প্রথম বাংলা গান এবং টিভিতে গাওয়া প্রথম গান। গানটি ছিল রক ধাচের। ওর বেশভূষাও ছিল চোখে পড়ার মতো। সবমিলিয়ে নতুন এক ঘরানার গান হওয়ায় গানটি বেশ আলোচিত হয়। বলা হয়ে থাকে, ওই গানটির মাধ্যমেই দেশে রক সংগীতের শুরু।

আপনার মা-বাবা সম্পর্কে জানতে চাই। আমরা জানি, চট্টগ্রামে আপনার বাবার নামে একটি সড়কের নামকরণ হয়েছে।

আমার বাবা এল এ চৌধুরী ও মা হামিদা চৌধুরী দুজনেই গানপ্রেমী ছিলেন। এটা আগেও বলেছি। আর বাবা রাজনীতি করতেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের দল করতেন। বাবার যে বিষয়টা দেখেছি, সাধারণ মানুষের জন্য ভীষণ টান ছিল। তিনি সারাদিনই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য অনেক সময় পরিবারকেও সময় দিতে পারতেন না।

বাবার নামে সড়ক নামকরণের দিন আমি ছিলাম। তো তার নামের ওই রাস্তাটি দিয়ে যাওয়ার অনুভূতিটা অন্যরকম ছিল।

আপনার জনপ্রিয় গানের মধ্যে 'হৃদয় কাদামাটির কোনো মূর্তি নয়' ও 'যতীন স্যারের ক্লাসে' গান দুটি অন্যতম...

যতীন স্যার বলতে অনেকে ভাবেন, যতীন স্যার নামের কোনো স্যার ছিলেন হয়তো। তাকে নিয়ে হয়তো লেখা। আসলে ব্যাপারটা তেমন না। দেখা যেত স্কুলে এরকম নামের স্যার থাকত। যতীন বাবু, চিত্ত বাবু এরকম আর কি। ওই জায়গা থেকেই যতীন স্যার নামটা বাছাই করে লিখেছিলাম গানটি।

আর হৃদয় কাদামাটির কোনো মূর্তি নয় গানটি মূলত বিরহী প্রেমিকদের নিয়ে লেখা। আগে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তরুণরা দেবদাস হয়ে যেত। ওটাকে বলত ছ্যাকা খাওয়া। তো ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার গান আসলে এটি।

নতুন যারা গান লিখছেন তাদের প্রতি আপনার কী বার্তা?

নতুন যারা লিখছে আমি তাদের বলব ছন্দ, মাত্রা মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু ওসবই যদি শিখতে যায় তাহলে গান লিখবে কখন? ছন্দে সমস্যা থাকলে সুরকারই ধরিয়ে দিতে পারবে। গীতিকারের অবজারভেশনটা থাকতে হবে। আর পড়তে হবে।